

জনগণের মুখোমুখি প্রেসিডেন্ট

এমিলি লুইস বোম্যান - মে ২৩, ২০১৮



(পররাষ্ট্র দপ্তর/ডুগ টমসন)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা সবসময়ই চেষ্টা করেন নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার নিত্যনতুন উপায় বের করতে। গত এক শতকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে ব্যাপারটা। সংবাদপত্রের রাজত্ব থেকে শুরু করে রেডিও-টিভির স্বর্ণযুগ হয়ে এখন চলছে ইন্টারনেট আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পালা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা তাদের কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব অবিকৃতভাবে জনগণকে পৌঁছে দিতে ব্যবহার করে আসছেন সময়ের সবচেয়ে নতুন প্রযুক্তিটাই।

প্রেসিডেন্টদের গণযোগাযোগের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডেভিড গ্রিনবার্গ অবশ্য জানালেন, থিওডোর রুজভেল্টের আগে কোন প্রেসিডেন্ট খুব নিয়মিতভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নেননি। ১৯০১ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন রুজভেল্ট। নিজের কর্মসূচি প্রকাশ আর প্রচারের জন্য সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানাতেন তিনি। পরের প্রেসিডেন্টরা এ ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এভাবে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে যায়।

ইতিহাসবিদ মার্গারেট ও'মারার মতে, প্রেসিডেন্টরা যখন ঘনিষ্ঠতা আর কর্তৃত্ব-- এ দুটির যথাযথ ভারসাম্য দেখাতে পারেন তখনই লোকে তাদের সবচেয়ে ভালোভাবে নেয়। ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর

দশকে ফ্র্যাংকলিন ডেলানো রুজভেল্টের রেডিও ভাষণ শুনে আমেরিকানদের মনে হতো, প্রেসিডেন্ট যেন তাদের বসার ঘরে বসেই কথা বলছেন। 'ফায়ারসাইড চ্যাট' হিসেবে পরিচিত ওই বক্তব্য মহামন্দা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন সময়ে আমেরিকানদের ভরসা যোগাতো। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চেয়েছিলেন, তার ভাষণ শুনে যেন মনে হয় তিনি পড়ার ঘরে ফায়ারপ্লেসের ওম নিতে নিতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। সে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে চালু হয়ে যায় 'ফায়ারসাইড চ্যাট' কথাটি।

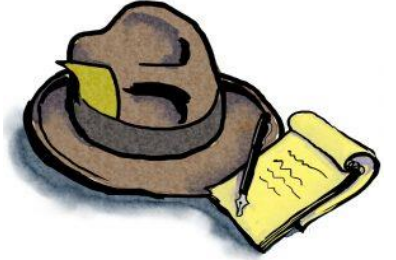


ইতিহাসবিদ গ্রিনবার্গ মনে করেন একজন প্রেসিডেন্টের ভূমিকা দুটি। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রনায়কের যিনি সারা দেশকে নেতৃত্ব দেন। আবার তিনি একজন রাজনৈতিক নেতাও যাকে বিশেষ কিছু আদর্শ আর নীতির পক্ষে কথা বলতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের কেউ কেউ বড় ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়কে এগিয়ে নিতে নিজের বাগ্মিতাকে কাজে লাগিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জন এফ কেনেডির ১৯৬৩ সালের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি কমেসমেন্ট ভাষণের কথা। আলোচিত ওই ভাষণের মাধ্যমে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার প্রথম চুক্তির পথ সুগম করেছিলেন কেনেডি।

সংবাদপত্রের মাধ্যমেও জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রেসিডেন্টরা। গ্রিনবার্গ বলেন, দ্বিমুখী এই সম্পর্কটা অনেক সময় বার্তা প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ এ দুয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়ায়।

ডোয়াইট আইজেনহাওয়ারের সময় প্রথম টেলিভিশনে সংবাদ সম্মেলনের দৃশ্য প্রচারিত হয়েছিল। তবে তা মিলনায়তন থেকে সরাসরি সম্প্রচারের প্রথম অনুমতি দেন কেনেডি।

সরাসরি সম্প্রচার ও অন দ্য রেকর্ড [প্রেস ব্রিফিং](#) একসময় নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রেসিডেন্টরাও আগের চেয়ে বেশি কৌশলী হয়ে ওঠেন। ১৯৬৯ সালে রিচার্ড নিক্সন হোয়াইট হাউস অফিস অব কমিউনিকেশন নামে দপ্তর খোলেন। সবচেয়ে বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে তিনি সন্ধ্যাবেলায় প্রেস কনফারেন্স শুরু করেন।



সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট হন রোনাল্ড রিগ্যান। তবে তার অনেক আগে থেকেই তাকে টিভিতে দেখে অভ্যস্ত আমেরিকানরা। কারণ, রাজনীতিতে নামার আগে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও টিভি ব্যক্তিত্ব।

প্রথম হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট চালু করে বিল ক্লিনটনের সরকার। এতে ই মেইল গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়। তবে ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের হাতে মাত্র দুটি ই মেইল করেছেন।

একটা হচ্ছে বিদেশে থাকা সেনাদের উদ্দেশে, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ১৯৯৮ সালে আবার মহাকাশে যাওয়া উপলক্ষে বর্ষীয়ান নভোচারী ও সিনেটর [জন গ্লেনকে](#)।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খোলে বারাক ওবামার প্রশাসন। বাজফিড এর মতো অনলাইন প্রকাশনার সাথে সাক্ষাতকার দেওয়ার পাশাপাশি রেডিট'স এর 'আস্ক মি এনিথিং' ফোরামে অংশ নিতেন ওবামা। এভাবে ডিজিটাল মিডিয়া আউটলেটগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়েছেন তিনি।



বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটার ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ। দেশবাসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য নিয়মিত টুইট করেন তিনি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা যার কাছে যেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে সে পথেই হাঁটেন। গ্রিনসবার্গ সেরকমই মনে করেন। যেমন, রিগ্যান টিভিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। আবার ট্রাম্প প্রায়ই টুইটার ব্যবহার করেন কারণ, 'এটাই তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ভালো যায়।'